পৌষ-লক্ষ্মী

১৩৫০ সালের পৌষ মাস। পঞ্চাশ হল শয়ের অর্ধেক। শয়ে শূন্য। শয়ের অর্ধেক পঞ্চাশেও গাঁয়ের অর্ধেক লোক ঝেড়ে মুছে নিয়ে গেছে, বাকী অর্ধেক যারা আছে তারাও আধমরা, হিসাব ঠিক আছে। গাঁয়ের প্রবীণেরা এবং বিচক্ষণেরা পালপাড়ায় কালীঘরের সামনে অশ্বত্থতলায় বসে তামাক খেতে খেতে সেই কথারই আলোচনা করে। এক ছিলিম তামাকেই গোটা মজলিসের এখন পরিতৃপ্তি হয়, কলকে আজকাল আর দুটো লাগে না; যে তামাক এক এক জনে পুরো এক ছিলিম খেয়েও তৃপ্তি পেত না, সেই তামাক দুটান টেনেই লোকে এখন কাশতে শুরু করে, বুকে শ্লেষ্মা ঘড়ঘড় করে উঠে। এবারের বানের ঠাণ্ডা ক্রমে শ্লেষ্মা হয়ে মানুষের ম্যালেরিয়া-জীর্ণ বুকে জমে বসেছে গাঁয়ের খিড়কি-ডোবার পচা জলে থক থকে দলাশের মত।

সবচেয়ে বয়স বেশি মুকুন্দ পালের—ষাট-পঁয়ষট্টি হবে। ভারিক্কি লোক। কালো কষকষে রঙ পালের, এককালে জোয়ানও ছিল খুব ভারি, তখন নাকি মাথায় ছিল বাবরি-চুলের বাহার। এখন পাল বুড়ো হয়েছে, তার ওপর এবারকার ম্যালেরিয়ায় ভুগে বার-কয়েক ধোপার পাটায় আছাড়-খাওয়া পুরানো কাপড়ের মতই এতবড় দেহখানা তার জ্যাল-জ্যাল করছে। মাথার চুলগুলি একেবারে কদমফুলি ছাঁটে ছাঁটা, এখন পেকে সাদা ধপধপ করছে; পাল প্রায়ই এখন মাথায় হাত বুলায়, খুঁটিয়ে ছাঁটা চুলগুলির কড়া ডগার উজানের টানে হাতের তালুতে বেশ সুড়সুড়ি লাগে।

পাল হুঁকাটা ঘোষের হাতে দিয়ে বলে, একবার যদি কেউ পুরো এক ছিলিম তামাক খেতে পারে ঘোষ—। বলেই সে কাশতে আরম্ভ করে। কেশে, কাশির ধমক সামলে কথাটা শেষ করে—তবে আর বুকে মালিশ লাগে না। বেবাক শ্লেষ্মা, বুঝেছ? আবার এক ধমক কাশি আসে, এবার মোটা এক চাকা শ্লেষ্মাও উঠে যায়, পাল আরাম পায়। ঘোষ তখন কাশতে শুরু করেছে। তারপর আরম্ভ হয় শয়ের অর্ধেক পঞ্চাশের আলোচনা। হিসাব-নিকাশ ঠিক আছে। চিত্রগুপ্তের কলম। ভুল কি হয়?

ঘোষ কয়েকবার ঘাড় নেড়ে বললে, তা হয়। মুনি-ঋষিদেরই মতি-বেভ্রম হয়, তা চিত্রগুপ্ত। হাজার হলেও চিত্রগুপ্ত তো বামুন নয়, কায়স্থ—এবারেই ভুল হয়েছে।

সকলে আশ্চর্য হয়ে যায়। কি ভুল হল? এ ওর মুখের দিকে তাকায়।

নদীর ধার পর্যন্ত খোলা পূর্বদিকের পানে হাত বাড়িয়ে দেখিয়ে ঘোষ বলে, ধান।

পূর্বদিকে নদীর ধার পর্যন্ত গাঁয়ের মাঠ, তিন ভাগে ভাগ করা—ষাঁড়া জোল, মাঝের জোল, বেনো কুল। নামেই তিন ভাগে ভাগ করা, নইলে মাঠ একটাই। গ্রামের কোল থেকে নদীর ধার পর্যন্ত সুবিস্তীর্ণ ধান্যক্ষেত্র। গোটা মাঠখানি এবার ধানে থইথই করছে, সোনার বরণ রঙ ধরে এসেছে। ওই ধানই জীবনকাঠি, মরণকাঠি; এবারের ধান ঘরে উঠলে জীবন

থাকবে, নইলে মরণ—অবধারিত মরণ, তাতে আর কোনোও সন্দেহ নাই। ভরসার মধ্যে বাগ্‌দীকাহার-মুচিরা যারা ঘর ছেড়ে পালিয়েছে, তারা যদি ফিরে আসে। আর যদি আসে দুমকা থেকে সাঁওতালের দল।

গাঁয়ের বাগদী-কাহার মুচি এদের যারা দিনমজুরি খাটে, চাষ করে না, তারা প্রতি বছরই বর্ষার সময় গাঁ ছেড়ে চলে যায়। বিশেষ করে অজন্মা আকাড়া হলে সেবার দল বেঁধে চলে যায়, অজন্মা না হলেও দু ঘর এক ঘর যায়, আবার ফেরে এই ধান কাটার সময়। কেউ কেউ সেই বছরেই ফেরে, কেউ কেউ ফেরে পাঁচ বছর পর, কেউ বা ফেরে এক পুরুষ পর। দল বেঁধে ফেরে এমনই বাহান্ন পউটির বছরে, ধানে ধানে ছয়লাপের পোষে। ওরা এমনই ধারা সুখের পায়রা চিরকাল, দুঃখের ঘরে থাকা ওদের স্বভাবের বাইরে। সকল সুখের মূল যখন লক্ষ্মী, তখন এবার ওরা আসবে—এই ভরসা নিয়ে খানিকটা শান্তি পায় পাল মশায়েরা। সকালে বিকালে ঠুকঠুক করে যায় ওদের পরিত্যক্ত পাড়াটার দিকে। পড়ো ভাঙা বাড়িগুলো খোঁজ করে, পাড়ার বাইরে বটবাগানের বটগাছগুলোর তলার দিকে চায়। এখানে খোঁজ করে, নূতন আগন্তুক কেউ এল কি না। এ গ্রাম থেকে পালিয়ে যেমন এখানকার ওরা অন্য গ্রামে যায়, তেমন অন্য গ্রামের তারাও তো এ গ্রামে আসতে পারে। তেমন-যারা আসে, তারা প্রথম বাসা পত্তন করে এই বটবাগানে কোনো গাছের তলায়। কিন্তু কেউ আসে নাই আজও পর্যন্ত। পালমশায়দের উৎকণ্ঠার সীমা নাই। থই-থই-করা মাঠ-ভরা ধান, এ তারা তুলবে কি করে? রাত্রে ঘুম পর্যন্ত হয় না।

তবুও মাঠে ধান কাটা চলছে। রুগ্ন দুর্বল শরীর নিয়েও মানুষ ভোরবেলায় কাঁথা গায়ে দিয়ে কাস্তে হাতে মাঠে যায়। মাথায় গামছা বাঁধে কন্ফটারের মত। নাক দিয়ে টপ টপ করে জল ঝরে, পৌষের ভোরের শীতে হাতের আঙুল বেঁকে যায়, তবুও সেই আড়ষ্ট হাতের মুঠায় কোনোমতে ধানের ঝাড়ের গোড়া চেপে ধরে ডান হাতের কাস্তে টানে।

মুকুন্দ পালের কৃষাণ কাল থেকে জ্বরে পড়েছে। পালকে আজ নিজেকেই আসতে হয়েছে মাঠে। কিন্তু কাস্তে যেন চলছে না। হেঁট হয়ে কাস্তে টানতে কোমরে টান ধরে অসহ্য বেদনায় টনটন করে উঠছে। যেন কোমরের দড়ির মত শিরাগুলো শুকিয়ে কাঠির মত শক্ত হয়ে গেছে; হাড়ের গাঁটে গাঁটে জমে গেছে বালিতে মাটিতে জমাট বাঁধা পাথরের চাঁইয়ের মত। পাল কোমরে হাত দুটি রেখে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। হেঁট হয়ে থাকা যত কঠিন, হেঁট হয়ে কিছুক্ষণ সোজা হয়ে দাঁড়ানও তেমনই কঠিন। শাঁখের করাত, যেতে কাটে, আসতেও কাটে, কোমরের ভিতরে যেন শাঁখের করাত চলছে মনে হচ্ছে।

—হায় ভগবান!—পাল উঠে দাঁড়িয়ে নিজের কাজটুকুর দিকে চেয়ে দেখে আপনার মনেই বললে, হায় ভগবান। শুধু আক্ষেপই নয়, নিদারুণ লজ্জায় তার মাথাও হেঁট হয়ে আসছে। আপনার কাছেই মাথা হেঁট হচ্ছে। কতটুকু কেটেছে সে। তালপাতায় বোনা চ্যাটাই, লম্বায় পাঁচ হাত, চওড়ায় আড়াই হাত, এখানে বলে 'তালাই'; এক তালাই-ভর জমির ধানও কাটা হয় নাই।

হঠাৎ তার চোখ ফেটে জল এল। তার পুরনো কথা মনে পড়ে গেল। ছেলেবেলায় তার সঙ্গীরা তাকে বলত—গাঁদা। যৌবন মুরুব্বিরা তার নাম দিয়েছিল—ভীম। প্রৌঢ়ত্বে লোকে বলত—মোটা মোড়ল, এখনও বলে। মনে পড়ে গেল পুরনো আমলের ধান কাটার কথা। সে সব আজ কাহিনী মনে হচ্ছে। এমন মাঠ থই-থই-করা ধান এবারেই নতুন নয়। কতবার হয়েছে। ভোরের আকাশে শুকতারা তখন জ্বলজ্বল করত আঁধার ঘরের মানিকের মত। উত্তর দিক থেকে সিরসির করে বয়ে যেত হাড়-কনকনানি ঠাণ্ডা বাতাস। গাছপালার পাতা থেকে গাছপালার শুকনো পাতার উপর সত্যি সত্যি টপটপ শব্দে শিশির ঝরত, ঘাসের উপর পা দিলে গোড়ালি পর্যন্ত ভিজে যেত। পথের ধুলার উপর পাটালির মত এক পুরু ধুলা শিশিরে ভিজে জমে থাকত, পা দিলে ভেঙে যেত। ধানের মাঠে এলে, শিশিরে-ভেজা নরম ধানের গাছে সে গন্ধ; বেলায় এসে আজ পাওয়া যাচ্ছে না, কিন্তু সে গন্ধ মনে আছে তার। সেই ভোর থেকে আরম্ভ হত ধান-কাটা।

পাল তার হাতখানা মেলে ধরলে চোখের সামনে; এ হাতের গ্রাস, লোকে বলে, এক পো চালের ভাত ওঠে। এক পো কি আর ওঠে? লোকে বাড়িয়ে বলে। তবে তার হাতখানা প্রকাণ্ড। এই হাতের এক মুঠায় সে খপখপ করে ধরত ধানের গোড়া আর ডান হাতে কাস্তের এক টানে কেটে চলত ঘাস-কাটার মত; তার এই মুঠার তিন মুঠা ধানে বাঁধা ধানের আঁটি অন্য লোকের বাঁধা আঁটির দ্বিগুন না হোক, দেড়া মোটা হত। বেলা এক প্রহর যেতে না যেতে, রোদের আঁচে ধানগাছ শুকিয়ে খড়মড়ে হবার আগেই ক্ষেতের এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত শেষ করে ফেলত।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সে শক্তি কমে আসারই কথা। তবুও গত বছর পর্যন্ত সে এক প্রহর বেলা পর্যন্ত আধখানা ক্ষেতের ধানও কেটেছে। কিন্তু এই কটা মাসে এ কি হল তার?

—কি কত্তা, ডাঁরিয়ে রইচ যে? কি হল?

আপনার ভাবনার মধ্যেই ডুবে গিয়েছিল পাল, তার মন উদাস হয়ে সেকালের সেই আমলে চলে গিয়েছিল, মধ্যে মধ্যে এই জমিখানাই যেন দেখাচ্ছিল সমস্তটা কাটা হয়ে গেছে, এ-ধার থেকে ও-ধার পর্যন্ত, আঁটি আঁটি করে সাজানো রয়েছে কাটা ধান, ক্ষেতের লালচে মাটি দেখা যাচ্ছে, লালচে মাটির উপর কাটা ধানের গোড়া জেগে রয়েছে লাল রঙের দাবার ছকের উপর সাদা রঙের ঘুঁটির মত।

পিছন থেকে কে ডেকে কথা বললে। পাল ঘুরে দাঁড়াল। দৃষ্টিও কমে এসেছে। গেল বছর পর্যন্তও পাল বিনা চশমায় চট-সেলাই-করা সুচে শনের সুতলির দড়ি পরিয়েছে, বস্তার মুখ সেলাই করেছে। কিন্তু এই বছরের এক ধাক্কাতেই বেলা কাবার করে দিলে, চারিদিকে ঝাপ্‌সা। তুলসী তলার পিদিম জ্বালার সময় হয়ে এল। আর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে পাল লোকটির দিকে তাকিয়ে বললে, কে?

—আমি গো; চিনতে পারছ না, না কি?

পালের এবার খেয়াল হল, ছোকরা-মানুষের গলা; মুহূর্তে সে চিনতে পারল ছোকরাকে।

মন তার বিষিয়ে উঠল।

—নজর গেল তাহলে কত্তা। আমি গো, চিকেষ্ট।

—চেকা?

—হ্যাঁ গো। বলি ডাঁরিয়ে রইচ যে?

তুই কোথা যাবি? মাঠ থেকে পালিয়ে এলি নাকি? জ্বর এল?

—জ্বর?—চিকেষ্ট হি-হি করে হাসতে লাগল।—জ্বর-ফর আমার কাছে ঘেঁষে না। সেই তোমার আশ্বিন মাসে একবার। তার পরে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছি।

পালের বুক থেকে একটা নিশ্বাস বেরিয়ে এল, সাপের গজরানির মত, নিশ্বাসের সঙ্গেই সে বললে হুঁ।

—মদ আর মাস ও হল জ্বরের যম। বুয়েচ?—হি-হি করে আবার হাসতে লাগল চেকা।

—তা যাবি কোথা, যা না কেনে? ফ্যাকফ্যাক করে হাসতে বুঝি মজা লাগছে আমার ছামনে ডাঁরিয়ে?

চেকা আবার হাসতে আরম্ভ করে দিলে। বললে, যাচ্ছি তোমার ওই মাঝের জোলে পাঁচ কিত্তে তিন বিঘের চকে—তোমার দরুন গো। এ খান সারা হয়ে গেল।

পাল হঠাৎ হেঁট হয়ে ঘষঘষ শব্দে আবার ধান কাটতে আরম্ভ করে দিলে। চেকার কথার ওই 'পাঁচ কিত্তে তিন বিঘে তোমার দরুন' কথাটা তপ্ত লোহার শলার মত পালের বুকে যেন বিঁধে গিয়েছে। ওই জমিটা পালের কাছ থেকে চেকা অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ কিনেছে এই বৎসরই বর্ষার ঠিক আগে। ধানের দর আঠারো টাকা, চাল তিরিশ, পালকে বাধ্য হয়ে বেচতে হয়েছে। চেকা বোধ হয় খোঁচা মারবার জন্যেই কথাটা বলেছে। খোঁচাটা লেগেছে পালের বুকে।

চেকা তবু গেল না। দাঁড়িয়ে হাসতে লাগল। বললে, সেই সকাল থেকে এই এক তালাই কাটলে না কি?

পাল এ কথারও কোন উত্তর দিলে না। সে ধান কেটেই চলল। চেকার এ কথার মধ্যেও হুল আছে।

—কত্তা!

পালের কোমর আবার কনকন করে উঠেছে; মনের জ্বালার উপর শরীরের যন্ত্রণায় পাল এবার আর আত্মসম্বরণ করতে পারলে না। সে খাড়া হয়ে উঠে দাঁড়াল দেহের উপর একটা হ্যাঁচকা টান মেরে, মট্ করে শব্দ হল হাড়ে। পাল রাগে অধীর হয়ে বলে উঠল, কেনে রে শালা, কেনে? কি, বলছিস কি?

চেকার হাসি বেড়ে গেল, সে চটপট শব্দে বার কয়েক বাই ঠুকে বললে, হবে না কি, এক হাত হবে না কি এই ধানের গদির উপর?

বলেই সে দাঁড়াল না, নিতান্ত অকস্মাৎ উচ্চকণ্ঠে একটা গান ধরে সে চলে গেল। পাল

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল কোমরে হাত দিয়ে। চোখ দিয়ে এবার তার জল গড়িয়ে পড়তে আরম্ভ করল।

মুকুন্দ পাল—এককালের ভীম, প্রৌঢ় বয়সের মোটা মোড়ল, তাকে ঠাট্টা করে গেল ওই শ্রীকৃষ্ণ—চেকা। সম্বন্ধে সে মুকুন্দের নাতি, সম্বন্ধটা ঠাট্টারই বটে; কিন্তু এ ঠাট্টা মুকুন্দের পক্ষে মর্মান্তিক।

শ্রীকৃষ্ণ এখন গ্রামের মধ্যে সকলের চেয়ে অবস্থাপন্ন চাষী। উঠানে গোলায় গোলায় ধান আছে, ঘরে টাকা আছে। মহামহিম শ্রীশ্রীকৃষ্ণ পাল বরাবরেষু বয়ানে লেখা এ গাঁয়ের লোকের সই করা খত আছে ওর ঘরে। 'পাঁচ কিত্তে তিন বিঘের চক' বলে সেই কথাটা চেকা ঠাট্টা করে বলে গেল। ওতে পাল ব্যথা পেয়েছে, দুঃখ পেয়েছে; কিন্তু ওর উপর হাত নাই। ও দুঃখ মনে মনেই চেপে রেখেছে মুকুন্দ। কিন্তু ওই যে বাই ঠুকে বলে গেল—হবে নাকি এক হাত? ওর অর্থ হল, মুকুন্দের শরীরের এ অবস্থা দেখে সে তার সঙ্গে একদফা কুস্তি লড়তে চেয়ে গেল।

একালের ছোকরাদের মধ্যে চেকাই হল সকলের চেয়ে বড় জোয়ান। পালের মুখে বিষণ্ণ হাসি ফুটে উঠল। মনে পড়ল, বছর আষ্টেক আগে আমুতির লড়াইয়ের আখড়ায় যখন শ্রীকৃষ্ণ সকলকে আছাড় দিয়ে আখড়ার মাটির উপর বাই ঠুকে পড়ে ছিল, তখন হাসতে হাসতে মুকুন্দ গিয়ে বলেছিল, কই আয় দেখি, আমার সঙ্গে আয় এক হাত।

অন্য পাঁচজনে, বিশেষ করে যগন্দ ঘোষ, তার হাত ধরে টেনে বলেছিল, ছি ছি ছি! তোমাকে না কি লড়তে হয় ওই বালকের সঙ্গে। ছি!

শঙ্কিত হয়ে বারণ করেছিল সবাই, পালের শরীরের যা ওজন, তাতে সে যদি চেকার উপর কোনোমতে চেপে পড়ে, তাহলেই ছোঁড়াটা ঘায়েল হয়ে যাবে। শঙ্কিত হয় নাই শুধু ছিকেষ্ট, সঙ্গে সঙ্গে সে উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলেছিল, এই, হট যাও সব, লড়ব আমি।—চেকার স্পর্ধা চিরকালের। পাঁয়তারায় ঘুরতে ঘুরতে আবার সে বলেছিল, মোটাকে সাথ আঁটা লড়েগা, হট যাও।—পালের দেহখানা প্রকাণ্ড বলে এবং লোকে তাকে মোটা মোড়ল বলে বলে, সেই দশের সামনেই সে নিজের নামকরণ করেছিল—আঁটা, অর্থাৎ আঁটসাঁট দেহ তরুণ। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তার সে গরম জল হয়ে গিয়েছিল। মুকুন্দ তাকে পাঁজাকোলা করে তুলে ধরে গোটা আখড়াটার চারিধার ঘুরে আখড়ার মাটির উপর ফেলে দিয়েছিল—বেশ একটু জোরেই ফেলে দিয়েছিল।

তাই আজ চেকা মোড়ল তাকে ঠাট্টা করে গেল। বাই ঠুকে আস্ফালন করে লড়াই করবার জন্যে প্রায় হাঁক মেরে ডাক দিয়ে গেল।

হায় ভগবান! কি কাল জ্বর তুমি দুনিয়ায় পাঠালে। রক্ত জল করে দিলে, মাংস সব যেন চিবিয়ে লোল করে দিলে, হাড়ে পর্যন্ত ঘুন ধরিয়ে দিলে। চোখের দৃষ্টি গেল। উঠে দাঁড়ালে মাথা ঘোরে। দু-পা জোরে হাঁটলে হাঁপাতে হয়। নইলে সে তো বুড়ো নয়। ষাট

বছর বয়স কি এমন বয়স? তার বাপ পঁয়ষট্টি বছর বয়সে পাঁচসেরী কোদাল চালিয়েছে জোয়ান কৃষাণের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়ে। সে নিজে? নিজেই তো সে এই বর্ষাতেও কোদাল চালিয়েছে, লাঙলের মুঠো ধরেছে। হঠাৎ এ কি হল? হায় ভগবান! বুড়ো করে দিলে?

—কি? চলছে না হাত? দাঁড়িয়ে আছ?

—কে?

—আমি।—সকরুণ কণ্ঠে বললে যগন্দ ঘোষ, আমিও পারলাম না। ফিরে এলাম।

—যগন্দ, এ কি হল ভাই যগন্দ?

যগন্দ বললে, লা এসে ঘাটে নেগেছে। আর দেরি নাই।—যগন্দর গলা কাঁপছে, স্পষ্ট বুঝতে পারলে মুকুন্দ। সঙ্গে সঙ্গে তারও চোয়ালের নীচের সমস্ত মাংসটা থরথর করে কাঁপতে লাগল।

যগন্দ এগিয়ে এসে বললে, তামাক খাও।

আলের উপর দুজনে বসল। মুকুন্দর হাতে হুঁকো ধরাই রইল। সে যেন বড়ই ভাবছে।

যগন্দ তাকে হুঁকোর কথা মনে পড়িয়ে দিল, খাও।

—হুঁ।—হুঁকোয় সে শুধু মুখই দিলে, টানলে না। তারপর হঠাৎ বললে, লায়ে পার হতে তো ভয় নেই যগন্দ, হরি বলে নাপিয়ে লায়ে চড়তে পারতাম, তবে তো! কিন্তু এ কি পাপের ভোগ বল তো? হ্যাঁ হে, তিন-চার মাসের কটা জ্বরে এ কি হল বল তো?

—বুড়ো হয়ে গেলাম ভাই।

মুকুন্দ অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, চেকা আমাকে বাই ঠুকে বলে গেল যগন্দ, এক হাত হবে না কি। আমাকে ঠাট্টা করে গেল।

রোদ উঠেছে। শীত কেটে এসেছে। হাত-পা কোমরের আড়ষ্ট ভাবটা কেটে গিয়েছে অনেকটা। হঠাৎ মুকুন্দ গায়ের র‍্যাপারখানা খুলে ফেললে।

যগন্দ বললে, করছ কি? ঠাণ্ডা লাগবে।

—উঁহু। আমার আর সহ্য হচ্ছে না। গা ঘামছে। দেখ তুমি।

যগন্দর কিন্তু ততখানি উৎসাহ হল না। সে বললে, মাঠে বসে আর কি করবে?—চল, বাড়ি যাই।

—তুমি যাও যগন্দ। আমার ভাই, ভুঁইখানা না সারলে চলবে না। কিষেণ ছোঁড়ার জ্বর।

যগন্দ অবাক হয়ে গেল। বললে, সকাল থেকে তো দেখলে, আবারও সাধ হচ্ছে তোমার?

—যাও, যাও হে, তুমি যাও।

মুকুন্দ আবার নেমে পড়ল মাঠে। যগন্দ চলে গেল। রোদের তাপ এসেছে, বেদনা-

ভরা সর্বাঙ্গে যেন মিঠা মিঠা সেক লাগছে। আরাম পাচ্ছে মুকুন্দ। আ-হা-হা, হে দেবতা, তোমার মত এমন মহিমা আর কারও নেই। তোমার রোদে পাঁশুটে ধানগাছে সবুজ রঙ ধরে, তোমার যত রোদ তত জল, তোমার তাপে আড়ষ্ট দেহে জোর ফিরে আসছে, গাঁঠে গাঁঠে বুড়ো বয়সের পুরু চর্বি গলছে। মুকুন্দ হাত দুটো উপরে তুলল, বার-কয়েক ভাঁজল, কব্জি থেকে হাতের মুঠোটা ভাঁজল, বার-কয়েক বসল উঠল। কিন্তু হাঁপ ধরছে। ধরুক। তবু তার মনে হল, সে যেন অনেকখানি ক্ষমতা ফিরে পেয়েছে—হ্যাঁ, অনেকখানি।

হেঁট হয়ে সে আবার ধানের গোড়া মুঠোয় চেপে ধরলে। কাস্তে চলতে আরম্ভ করল।

—ওরে বাস রে। এ যে ভীমের মত ধান কাটতে লাগছে!—বছর বাইশের একটি মেয়ে, এক হাতে জলখাবার, অন্য হাতে জলের ঘটি নিয়ে এসে দাঁড়াল। মুকুন্দ ধান কেটে চলেছিল প্রচণ্ড উৎসাহের সঙ্গে। কিন্তু তাতে ধান কাটার চেয়ে তার দেহখানাই যেন বেশি চলছিল। ভাঙা কল চলে, তাতে যেমন কাজের চেয়ে কলটা ঝাঁকুনি খেয়ে নড়ে বেশি, শব্দ হয় জোরে, তেমনি ধারা ধান কাটার বেগের চেয়ে মুকুন্দের মনের আবেগটা শরীরে প্রকাশ পাচ্ছিল বেশি। সে কিন্তু মুকুন্দ বুঝতে পারছিল না। সে কাজ করেই চলেছিল। হঠাৎ মেয়ের গলায় ওই কথাটা শুনে, সে সোজা খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে হা-হা করে হেসে উঠল। সমস্ত মাঠখানায় ঐ নদীর ধার পর্যন্ত তবকে তবকে যেন সে হাসির প্রতিধ্বনি বিছিয়ে গেল। মোটা গলায় সে ছড়া কাটলে—

সিঁদুর-মুখী ধানে ধানে ভরিবে গোলা
আমার সোনামুখীর হবে সোনার কাঠির মালা।

—ওই! তোমার হল কি আজ বুড়ো বয়সে?—মেয়েটি বললে। সে সত্যিই বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল।

মুকুন্দ চমকে উঠল। মুহূর্তে তার হাসি থেমে গেল। মুখখানা হয়ে গেল পাথরের মত। তার অকস্মাৎ ভুল হয়ে গিয়েছিল। বহুকাল আগে, তখন তার বয়স ত্রিশ। উনত্রিশ বছর বয়সে তার তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী মারা যায়। একুশ বছরে গিয়েছিল প্রথম স্ত্রী, পঁচিশ বছরে দ্বিতীয় জনা—একটি ছ-বছরের মেয়ে রেখে গিয়েছিল; উনত্রিশ বছর বয়সে তৃতীয় জনা। লোকে বলত, মুকুন্দ পাল অজগর পুরুষ; বিয়ে হলেই নির্ঘাত যাবে। মুকুন্দও এটা বিশ্বাস করেছিল। গণৎকারেও তাই বলেছিল, রাক্ষস গণ, পত্নীস্থানে শনি মঙ্গল রাহু; শিবের সাধ্যি নাই তোমার পরিবার রক্ষা করতে। মুকুন্দ নিজের হাতের তালুর কড়ে আঙুলটরে নীচে স্পষ্ট দেখেছে অসংখ্য কাটাকুটির দাগ। তাই সে আর বিয়ে না করে ঘরে এনেছিল পাশের গ্রাম চণ্ডীপুরের বাবুদের বাড়ির একটি বিধবা তরুণী ঝিকে। ব্রাহ্মণ বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করত, জলচল জাতের মেয়ে, তাতে আর ভুল নাই; তবুও অধিকন্তু ন দোষায়—মুকুন্দ তাকে বৈরাগীদের আখড়ায় কণ্ঠি পরিয়ে বৈষ্ণবী করে পেড়ে-শাড়ি, হাতে চুড়ি পরিয়ে ঘরে এনেছিল। ত্রিশ বছর আগে, এমনই করে সে আসত তার জলখাবার নিয়ে। তেরো শ' বিশ সালও ছিল একটা শূন্যের বছর, সেবারও হয়েছিল এমনই বান, এমনই ধান। হয় নি শুধু চালের মন

তিরিশ টাকা, আর হয় নি এমন কাল জ্বর। সেবারও ধান কাটছিল মাঠে। সে এসে বলেছিল ঠিক ওই কথাটি, ঠিক ওই কটি কথা, মুকুন্দ এমনই করে হেসেছিল আর ওই ছড়াটি কেটেছিল। আজও সেই রকম মাঠ ভরা ধান। আজও সে যেন ঠিক তেমনই হুসহুস করে ধান কেটে চলেছে, এমন সময় তেমনই ভাবে এসে দাঁড়িয়ে সেই কথা কয়টি বলায় মুকুন্দের ভুল হয়ে গেছে। বৈষ্ণবীও অনেককাল আগে মরে গেছে। মুকুন্দ বলে, গত হয়েছে।

এ মেয়েটি মুকুন্দের নাতনী—মেয়ের মেয়ে। সম্বন্ধ ঠাট্টার। কিন্তু মুকুন্দ কখনও ঠাট্টা করে না। একটি ছেলে কোলে নিয়ে মেয়েটি পনেরো বছরে বিধবা হয়েছে। মেয়ে বিধবা হয়েছিল ওই মেয়েকে কোলে নিয়ে। মুকুন্দ জীবনে দুটি শিশুকে কোলে করে মানুষ করেছে, প্রথম তার নিজের মেয়ে, তারপর এই নাতনীকে। নাতনীর ছেলেকে সে কোলে করে না। না, কাজ নাই।

দুই

মুকুন্দ বাড়ি এসে বসে হাঁপাচ্ছিল। কিন্তু তাতে তার মেজাজ খারাপ হয় নি। শরীর এলে মেরে গিয়েছে, কিন্তু তাতে কোনো অসুখ বোধ করছে না। কাজ সে অনেকটা করেছে। অনেকটা। সে খুশী হয়েছে। স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে সে, সে বুড়ো হয় নাই। আসল দরকার ওষুধ আর খাওয়া-দাওয়ার, আর দরকার কাজের অভ্যাসের।

মেয়ে লক্ষ্মী এসে বাপকে দেখে কিন্তু শিউরে উঠল, বললে, বাবা তোমার কি শরীরের ওপর এতটুকুন মায়া-মমতা নাই? মুখের চেহারা কি হয়েছে দেখ দেখি। সরস্বতী বলছিল—

—কি বলছিল সরস্বতী?

লক্ষ্মীর মেয়ে সরস্বতী। পাল মশায়ের সেই নাতনীটি। লক্ষ্মী বললে, বলছিল—কত্তাদাদা ধান কাটছে, বাবা রে বাবা, একটা জোয়ানেরও সাধ্যি নাই এমন হাঁই হাঁই করে কাটতে।

পাল হা-হা করে হেসে উঠল। মাঠে আজ যে হাসি হেসেছিল, সে হাসি সে জোয়ান বয়সে হাসত; যে হাসি সে সরস্বতী বিধবা হবার পর আজকের আগে আর হাসে নাই, সেই হাসি। হাসির আওয়াজের ধাক্কায় দেওয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা কাঁসার বড় থোরাটায় মৃদু প্রতিধ্বনির রেশ বেজে উঠল।

লক্ষ্মী চমকে উঠল। বাবা হল কি?

—তোর বেটি বলে কি লক্ষ্মী, আমাকে বলে বুড়ো! তাই—। সে আবার হা-হা করে হেসে উঠে বললে, তাই তোর বেটিকে শুনিয়ে দিলাম সেই ছড়াটা, যে ছড়া বলতাম তোর মাকে।

লক্ষ্মী হাসলে।

পাল বললে, জানিস মা, এবার ধান যা হয়েছে। আ-হা-হা। ধান নয় মা, সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। এবার খামারে বোধ হয় ধান বাঁধতে জায়গাই হবে না। তা ছাড়া গরু দুটোর যা হাল হয়ে আছে, তাতে—

পাল অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়ল। কেলের জন্যে ভাবি না। ও আমার ঠিক আছে।

ও আমার ক্ষ্যাণজন্মা। ভাবনা বাছুরটার জন্যে। হাজার হলেও কাঁচা হাড়।

কেলে, পাল মশায়ের প্রিয়তম হেলে বলদ। একেবারে শৈশব থেকে তাকে পালন করেছে। এখন বুড়ো হয়েছে, কিন্তু ভরা বয়সে কেলে ছিল এখানকার বিখ্যাত হেলে। পাল একা নয়, এখানকার সকল চাষীতেই একবাক্যে বলে, কেলে ক্ষণজন্মা গরু। একা কেলের সঙ্গে কাঁধ দিয়ে একে একে চারটা বলদ অকালে ঘায়েল হয়ে গিয়েছে। গতবার আবার একটা বাছুর অর্থাৎ সদ্য জোয়ান বলদ কেনা হয়েছে। কিন্তু আজও সে কেলের ডাইনে বইতে পারে না। এবার দুটা বলদেরই খুঁড়িয়া হয়েছিল গো-মড়কের সময়। দুটাই ভাগ্যক্রমে বেঁচেছে, কিন্তু অত্যন্ত দুর্বল হয়ে গিয়েছে। পাল কেলের জন্য ভাবে না। ভাবনা তার ওই নতুন সদ্য জোয়ান হেলেটার জন্য।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে পাল বললে, চেকা আমাকে আজ বাই ঠুকে ঠাট্টা করলে মা।

কেউ উত্তর দিলে না। পাল পিছনে তাকিয়ে দেখলে লক্ষ্মী নাই, সে চলে গিয়েছে।

পাল উঠে গিয়ে দাঁড়াল কেলের কাছে। কেলে ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলে পালের দিকে চাইলে, তার গা শুঁকলে, তারপর ঘাড়টা লম্বা টান করে মুখটা এগিয়ে দিলে মুকুন্দের বুকের কাছে। এর অর্থ হল, গলকম্বলে সুড়সুড়ি দিয়ে দাও। পাল হেসে তার গলায় হাত বুলিয়ে পিঠে দুটো চাপড় মেরে বললে, দেখব বেটা এবার, কেমন ক্ষ্যামতা তোমার। হ্যাঁ।

তারপর আবার বললে, দাঁড়া না, তাজা করে দিচ্ছি। রশির মেয়ার ব্যবস্থা করছি আজ থেকে।—রশি হল ধেনো মদের সব চেয়ে কড়া তেজী অংশ। মেয়া হল তারই পচানো জিনিসের ছিবড়ে। ভারি উপকারী আর পোষ্টাই গরুর পক্ষে। চেকা মোড়ল নিজে খায় গৃহজাত অর্থাৎ ঘরে চোলাই-করা মদ। গরুদের খাওয়ায় রশি-মেয়া। একেবারে তাগড়া হয়ে আছে চেকার গরুগুলা; চেকা খায় মদের সঙ্গে মাংস। হাঁস আছে একপাল, হাঁসের বাচ্ছা খায়।

—কি করছ কত্তা?—সরস্বতী দাঁড়াল এসে দাওয়ার উপর।—খেতে দিয়েছি তোমার কেলেকে, উপোস করিয়ে রাখি নাই।

—কি?

—এস, ত্যাল মাখো। চান কর। খেতে-দেতে হবে না?

—হ্যাঁ হ্যাঁ।

পাল এসে বসল। তেলের বাটিটা এগিয়ে দিলে নাতনী। পাল বললে, এক কাজ কর দিকিনি। ত্যালটা গরম করে নিয়ে আয় দিকিন।

গরম তেল মালিশ করতে বসে সে আবার ডাকলে, সরস্বতী।

—কি?

—এই পিঠে খানিক ত্যাল মালিশ করে দে তো বুন। খুব করে, আচ্ছা করে। উঁহু, উ তোর হচ্ছে না। আরও জোরে।

—আর আমার জোর নাই বাপু।

পাল হা-হা করে হেসে উঠল। বললে, আচ্ছা, তবে গোটাকতক কিল মার দিকিনি। যত জোর আছে তোর।—আচ্ছা। আচ্ছা। আচ্ছা।

আমার হাতে লাগছে বাপু, আর আমি পারব না।—সরস্বতী সত্যিই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল।

পাল আবার হা-হা করে হেসে উঠল। বলল, আমার কিন্তু তোর নরম হাতের কিল ভারি মিষ্টি লাগছে।

সরস্বতী সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল। কর্তার মুখে এই এই ধারার কথাবার্তা কখনও শোনে নাই। হল কি কর্তার। মাকে বললে সরস্বতী, কত্তার গতিক ভাল নয় মা।

লক্ষ্মী চমকে উঠল। কথাটা তারও মনে হয়েছে, বাপের সেই হাসি শুনে। এ হাসি সে শুনেছে ছেলেবেলায়। বাপকে তখন লোক বলত—ভীম। সন্ধ্যার পর বাইরের দাওয়ায় পাঁচজনের সঙ্গে বসে তার বাবা এমনই ভাবে হাসত; সে তখন ছোট মেয়ে, বাড়ির ভিতরের দাওয়ায় শুয়ে ঘুমাত, বাবার হাসিতে তার ঘুম ভেঙে যেত।

বৈষ্ণবী মা বকত বাবাকে, কি এমন করে হাস, মেয়েটার ঘুম ভেঙে যায়, চমকিয়ে ওঠে।

বাবা আবার হাসত হা-হা করে। কাঁসার বাসনে খনখনে আওয়াজের রেশ বেজে উঠত, দরজায় কি জানালায় হাত দিয়ে থাকলে মনে হত, কি যেন একটা শিউরে উঠছে তার ভিতরে। সে হাসির প্রথম পর্দা ছিঁড়েছিল বৈষ্ণবী মা যাবার পর। তারপর খাদে নেমে ছিল লক্ষ্মী নিজে বিধবা হবার পর, সরস্বতী বিধবা হবার পর সে হাসি আর হাসে নাই তার বাবা। আজ সেই হাসি হাসতে শুনে কথাটা তারও মনে হয়েছে।

সরস্বতী বললে, কত্তা হয়ত আর বাঁচবে না, নয়ত কত্তার মাথা খারাপ হয়েছে। লক্ষ্মী শিউরে উঠে বললে, ও-কথা বলিস না সরস্বতী। তাহলে আমাদের দশা কি হবে, ভাব দেখি।

সরস্বতী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেই চলে গেল সেখান থেকে।

লক্ষ্মী চুপ করে বসে ভাবছিল। যতই অশুভ হোক, সরস্বতী কথাটা মিথ্যা বলে নাই। আজ সন্ধ্যেবেলায় বলদ দুটোকে রশি আর মেয়া খাওয়াবার ঝোঁক উঠেছে, নিজে বৈষ্ণব মানুষ, মদকে যার এত ঘেন্না সেই লোক নিজে হাতে ওই সব জিনিস ঘেঁটেছে। বলদকে মেয়া রশি অনেকবারই খাওয়ানো হয়েছে, কিন্তু সেসব করত রাখালে। বাবা নাকে কাপড় দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত দূরে। সেই লোক নিজে হাতে এই বুড়ো বয়সে—। চোখে জল এল লক্ষ্মীর। রাখাল নাই, কিন্তু কাহারপাড়ার কাউকে ডাকলেই হত। এ কি মতিভ্রম।

একটু বসে থেকে সে উঠল। উৎকণ্ঠা এবং কৌতূহলও হল বাবা কি করছে দেখবার জন্যে; সে চুপিচুপি বাবার ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। আশ্চর্য হয়ে গেল কোঠার উপরে ধুপধাপ শব্দ শুনে। যেন দুরমুশ দিয়ে কাঠের তক্তার উপর মাটি বিছানো মেঝেটা পিটছে। সন্তর্পণে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গিয়ে আড়াল থেকে উঁকি মেরে সে অবাক হয়ে গেল। তার বাবা কুস্তি-গীরের মত কাপড় সেঁটে রীতিমত বৈঠক দিচ্ছে, হাঁপাচ্ছে। ধীরে ধীরে লক্ষ্মী নেমে এল। হায় রে। এই বয়সে বাবা শেষে পাগল হয়ে গেল।

তিন

শুধু মেয়ে আর নাতনীই নয়, গোটা গাঁয়ের লোকেরই কেমন যেন একটু খটকা লেগেছে। পাগল হল না কি? তার ওই হা-হা করে হাসি শুনে তারা পরস্পরের মুখের দিকে চায়। ভোর থেকে আরম্ভ করে জলখাবার বেলা পর্যন্ত পাল মাঠে ধান কাটে। তাতে অবশ্য কেউ কিছু মনে করে না। পালের কৃষাণটার জ্বরের সঙ্গে বুকের দোষ হয়েছে, আধা-ডাক্তার আধা-কবরেজ ভাগবতচরণ বলেছে, মারে হরি রাখে কে?—লোকটা মরবে। আজও পর্যন্ত বাগ্দী-কাহার যারা বর্ষার সময় চলে গিয়েছে, তারা কেউ ফেরে নাই। দুমকার ওদিক থেকে একটি দল সাঁওতালও আজ পর্যন্ত এ অঞ্চলে আসে নাই। বর্ধমানে দামোদরের বাঁধ তৈরি হচ্ছে, রেলের সাঁকো তৈরি হচ্ছে, সারি সারি ক্রোশ বরাবর লম্বা এক-একটা সাঁকো; উড়ো জাহাজের আস্তানা তৈরি হচ্ছে এখানে-ওখানে-সেখানে—কোনোটা দু ক্রোশ, কোনোটা পাঁচ ক্রোশ লম্বা; লাখে লাখে মজুর খাটছে, টাকাটার কমে মজুরি নাই, পাকা-মেঝের ঘরে দিচ্ছে নাকি থাকতে, ডাক্তার-ওষুধের পয়সা লাগে না, এই ঢাউস বড় বড় মোটরে চড়িয়ে নিয়ে যায়, আবার মোটরে দিয়ে যায়। সাহেবেরা সেখানে সন্ধ্যার পর নাচ গান হল্লা করে। মোটা বকশিশ দেয়। ভালো ভালো বিলাতী মদের বোতল নাকি গড়াগড়ি যাচ্ছে; টিনে-বন্ধ খাবার। এসবেরও প্রসাদ কি আর কিছু কিছু না পায় তারা? সব—সব মজুর গিয়ে সেখানে জুটেছে। কিসের জন্য এখানে আসবে?

নিজের নিজের ধান নিজে না কেটে উপায় কি? কাটেও তো তারা চিরকাল। এবার না হয় রোগ ধরেছে—কাল রোগ। তবু তো ধান তুলতে হবে। মাঠ-ভরা ধান, গোটা বছর রত্নাকর মুনির মত উইকে একপিঠ ভুঁইকে একপিঠ দিয়ে তপস্যার ফসল—লক্ষ্মীর আটনের দেবতা, গোটা বছরের মুখের ভাত, চালের খড়, গরুর আহার—এ তো তুলতেই হবে। ঘরের খামার খাঁ-খাঁ করছে, লক্ষ্মীর আটন খালি পড়ে আছে; গোলার মধ্যে চামচিকেতে বাসা বেঁধেছে, মাকড়সায় জাল বুনেছে; গোলার মধ্যে নিকিয়ে পরিষ্কার করে সব পরিপূর্ণ করে তুলতে হবে। তুলবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেও সবাই, কিন্তু পালের ধান কাটা দেখে লোকে অবাক হয়েছে। পাল ধান কাটে আর আপন মনেই বলে, হেঁই-হেঁই-হেঁই। পা ফেলে যেন রোখা মাতালের মত। পাল কিছু দিন আগেও উঠত ধীরে ধীরে, বলত, আর কি সেদিন আছে? তাড়াহুড়ো করে উঠতে গেলে মাথা ঘোরে।—বলে হাসত। সেই পালের হঠাৎ যেন নব-যৌবন হয়েছে। এ তো ভালো নয়। এমন করে খাটতে গেলে কোনদিন বুক ধড়ফড় করে মাঠেই মুখ গুঁজে পড়বে, আর উঠবে না, না হয়তো খাটুনির ধমকে পাল্‌টে পড়বে জ্বরে। এর উপর জ্বর হলে মেরে দিয়ে যাবে। নাও যদি মরে, তবুও উঠে আর হেঁটে বেড়াতে দেবে না সহজে।

তার উপর এসব কথা বললে, ওই হাসি।

যোগেন্দ্র বললে, কি, হল কি তোমার, বল দেখি?

পাল সেই হাসি হাসতে আরম্ভ করলে। তারপর হাসি থামিয়ে বললে, 'সন্ধ্যা বেলায় বলব।

—ওরে বাপরে। এত হাসি কিসের গো কত্তা ?

গলার আওয়াজেই চিনতে পেরেছিল পাল চেকা মোড়লকে। পিছন ফিরে দেখলে, চেকা পালই বটে। পাল ভুরু নাচিয়ে মাথা দুলিয়ে বললে, পারিস ? বলি, তুই পারিস ?

—কি ?

—এমনই হাসতে ? মরদ তো বটিস। জোয়ান বয়সও বটে, পয়সাও ঢের আছে। পারিস ?—কয়েক মুহূর্ত সে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেকার দিকে চেয়ে থেকে আবার বললে, ফুসফুসি ফেটে যাবে কোলা-ব্যাঙের পেটের মত।—বলেই সে আবার হাসতে আরম্ভ করলে সেই হাসি।

যোগেন্দ্র অবাক হয়ে গেল। তার আর কোনো রকম সংশয় রইল না, পালের মাথার সত্যিই গোলমাল হয়েছে। চেকাও প্রথমটা চুপ করে ছিল। একটু পর সে বললে, পালকে কোনো কথা না বলে যোগেন্দ্রকে বললে—ঘোষ-কত্তা, পাল-কত্তার নাকটা দেখেছ ?

যোগেন্দ্র একটু বিরক্ত হয়েই তার মুখের দিকে চাইলে। পালের ভুরুও কুঁচকে উঠল। চেকা যে এবার বাঁকা বঁড়শির মত কথা বলবে, তাতে তাদের সন্দেহ ছিল না। চেকাকে তারা চেনে। টাকার গরমে মাটিতে ওর পা পড়তে চায় না। ওর কথায় জলের মাছ গায়ের জ্বালায় ডাঙায় মাথা ঠুকে আছাড় খেয়ে পড়ে।

চেকা বললে, দেখ ভালো করে দেখ। হুঁ হুঁ ঠিক।

—কি ?

—বেঁকেছে। কত্তার নাকটা বেঁকে গিয়েছে।

নাক বেঁকে গেলে মানুষের ছ মাসের মধ্যে অবধারিত মৃত্যু। নীল তারা দেখতে পায় না চোখ টিপে, আকাশের অরুন্ধতী নক্ষত্র দেখতে পায় না। এমনিই নাকি অনেক কিছু হয়। চেকার কথা শুনে যোগেন্দ্র শিউরে উঠল। সে তার ঘোলাটে চোখের নিস্তেজ দৃষ্টি যথাসাধ্য তীক্ষ্ণ করে চাইলে পালের মুখের দিকে। পালও চমকে উঠল, তার ডান হাতে ছিল কাস্তে, বাঁ হাতটা আপনি যেন উঠে গিয়ে পড়ল নাকের উপর।

চেকা হি-হি করে হেসে উঠল। শুধু হাসি নয়, তার সঙ্গে অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গি। হাসির ধমকে তার মাথাটা মাটিতে ঠেকে গেল প্রথমটা, হাসির ধমকেই আবার যেন সোজা হয়ে উঠে পিছনের দিকে উল্‌টে পড়ে যাবার উপক্রম করলে।

চেকা বললে, ছমাস—আর ছমাস।—বলেই সে চলতে আরম্ভ করলে। কিছু দূরে গিয়েই সে আবার দাঁড়াল, বললে, মরণের ছমাস আগে, বুঝলে কত্তা, মানুষের এমনি নব-যৌবন হয়। বুঝলে ?

পাল আবার উৎকটভাবে হেসে উঠল, নিজের বাই দুটোতে চাপড় মেরে বললে, হবে নাকি ?

চেকা কিন্তু আর দাঁড়াল না। চলে গেল। পাল তার দিকেই চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বললে, যগন্দ! কেউ সাড়া দিল না। যোগেন্দ্র চলে গিয়েছে।

পাল কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে আপনার নাকে হাত দিলে।

—কত্তা, আজ যে ডাঁড়িয়ে রইচ?

সরস্বতী। সরস্বতী এসেছে জলখাবার নিয়ে।

—হুঁ।

—হুঁ কি? শরীর ভালো আছে তো?

—দেখ তো সরস্বতী, নাকটায় কি হল?

—কি হল? কই কিছুই তো হয় নাই। যেমন ছিল তেমনই আছে?

সরস্বতী খুব কাছে এসে খুব ভালো করে তাকিয়ে দেখলে, হ্যাঁ, কই কিছুই তো—। উঃ, কত্তা, কি খেয়েছ তুমি কত্তা? সরস্বতী শিউরে উঠে পিছিয়ে গেল।

লক্ষ্মী বললে মেয়েকে, চুপ কর, এ কথা কাউকে যেন বলিস না।

পাল কিন্তু নিজেই জানালে যোগেন্দ্রকে। সন্ধ্যাবেলায় তাকে ডাকলে, শোন, এস।

—কোথা?

—এস না আমার সঙ্গে।

গাঁয়ের বাইরে বট-বাগানে একটা গাছতলায় বসল পাল, যোগেন্দ্রকে বললে, বস।

যোগেন্দ্র অবাক হয়ে গিয়েছিলই, সঙ্গে সঙ্গে ভয়ও করেছিল। মাথা খারাপ লোক, কখন কি করে বসবে হয়ত!

পাল তার গায়ের আলোয়ানের ভিতর থেকে বের করলে একটি বোতল, তার মুখেই পরানো ছিল কাচের ছোট ওষুধ-খাওয়ার গেলাস একটি।

—কি?—যোগেন্দ্রর চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল।

পাল কিন্তু অত্যন্ত সহজভাবে বললে, গৃহজাত। খাও।

—সে কি?

গৃহজাত মানে—লুকিয়ে ঘরে চোলাই করা মদ। সাওড়াপুরের ভল্লা বাগদীরা তৈরী করে নদীর ধারে। এখানকার অনেকে গোপনে কিনে খায়। এ গাঁয়েরও দু-চারজন খায়; চেকা মোড়লই খায়। কিন্তু তা বলে যোগেন্দ্র খাবে কি বলে? পালই বা খায় কি বলে? বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষা তাদের, বয়স হয়েছে, যাকে বলে এক পা ডোঙায় এক পা ডাঙায়। আজ পালের এ কি আচরণ?

ততক্ষণে ছোট গেলাসে খানিকটা ঢেলে ঢুক করে ওষুধ খাওয়ার মত খেয়ে ফেলে পাল বললে, জ্বর পালাতে পথ পাবে না, তিন দিনে গায়ে তাগদ পাবে; আমার মতন খাটতে পারবে।

গেলাসটায় যোগেন্দ্রর জন্যই খানিকটা ঢালতে ঢালতে সে বললে, ওই শালা চেকা, চেকা

শালা একদিন আমাকে বলেছিল। বুঝলে, আমার খানিক আশ্চর্যও লাগত, সবাই জ্বরে ওলট-পালট খেলে, ওই শালার একবার কই জ্বর হল না কেন? তা শালাই আমাকে বললে, সেই যে, যেদিন বাই ঠুকে আমাকে ঠাট্টা করেছিল, সেই দিন। বলেছিল—মদ-মাস খাই, জ্বর আমার কাছে ঘেঁষতে পারে না। তা দেখলাম, হ্যাঁ, দব্যিটা উপকারী বটে। তাগদ আমি পেয়েছি। নাও, খাও।

যোগেন্দ্র সভয়ে সরে বসল। বললে, না।

—না লয়, খাও।

—ছি ছি, ছি পাল, ছি। এই বুড়ো বয়সে—

—ধেৎ তেরি!—পাল ধমক দিয়ে বলে উঠল—কিসের বুড়ো বয়স হে? বুড়ো বয়স কিসের? বুড়ো বয়স! কই ডেকে আন তোমার কে ছোকরা আছে, ডেকে আন আমার কাছে। বুড়ো বয়স!

যোগেন্দ্রের জন্যে ঢালা গেলাসটি নিজেই সে খেয়ে নিলে।

—আশি বছর। আশি বছরে তো সোজা হয়ে বেড়াব হে যগন্দ।

যোগেন্দ্র বললে, কিন্তু ধর্ম আছে তো!

—হ্যাঁ, আছে বইকি। আলবত আছে। এ তো ওষুধ। ধম্মেতে ওষুধ খেতে বারণ করে নাকি? ধম্মেতে বলে নাকি, ওষুধ না খেয়ে রোগে ভুগে খকখক করে কেশে কুঁজো হয়ে মর তুমি? যদি বলে তো বলে। ধম্ম আমার ধান তুলে দেবে? ধম্ম!—হঠাৎ সে নিজের হাতখানা শক্ত করে যোগেন্দ্রের দিকে বাড়িয়ে দিলে। দেখ, শরীরটা ক'দিনেই কেমন বেঁধেছে দেখ। বুড়ো। বুড়ো বয়স!

যোগেন্দ্র হাতখানা নেড়ে দেখতে বাধ্য হল, কারণ পাল একরকম হাতখানা তার ঘাড়েই চাপিয়ে দিয়েছিল। অবাক হয়ে গেল যোগেন্দ্র। সত্যই আর সে রকম তলতলে ঝলঝলে নয় চামড়া। অনেকটা শক্ত হয়েছে। সে স্বীকার করতে বাধ্য হল।

—হুঁ, তা হয়েছে।

পাল আবার খানিকটা গেলাসে ঢেলে বললে, তবে খা, খা রে খা, যৈবন ফিরে আসবে। —বলে হা-হা করে হেসে উঠল।

যোগেন্দ্র এবার হাত বাড়িয়েছিল, কিন্তু হাসিতে চমকে উঠে বললে, না মাইরি, কি যে হাসছ! এখুনি কে এসে পড়বে! তা হলে আমি খাব না ভাই।—পালের হাসি যেন শাঁখের আওয়াজ। কাছাকাছি শাঁখ বাজলে তার শব্দ যেমন কানের ভিতর থেকে মাথার ভিতরে, বুকের ভিতরে, কাঁধ থেকে হাতের শিরায় ধ্বনির রেশ তুলে টান হয়ে উঠে, পালের হাসির গমকগুলো তেমনি ভাবে যোগেন্দ্রের দেহের মধ্যে সুর তুললে। ভয়ও জাগল, আবার চঞ্চলও হল মন, কত কথা মনে পড়ে গেল। যোগেন্দ্র মুখের কাছে নিয়ে গিয়েও ভাবছিল। এঁ, কি গন্ধ!

—নাক টিপে ধর বাঁ হাতে। হ্যাঁ হ্যাঁ। বাস, দে ঢেলে মুখে। বাস।—বলেই সে

আবার হেসে উঠল হা-হা করে।

—এই, এই, না এমন করে হাসলে হবে না—না, না।

তবু থামল না পালের হাসি।

কিছুক্ষণ পর যোগেন্দ্রও হাসছিল পালের সঙ্গে প্রায় পাল্লা দিয়ে। কথাটা অবশ্য হাসির কথা। পাল বলছে, এবার পৌষ-লক্ষ্মীর দিনে ভাসান-গান করতে হবে, আগে যেমন হত। আমাদের যে দল ছিল, সেই দলের ভাসান-গান। সে কালে পাল চন্দ্রচূড় সাজত, আবার পায়ে কালিমাখা ন্যাকড়া জড়িয়ে গোদা মালোও সাজত। পাল এখন সেই দুটোই সাজতে চায়। আর যোগেন্দ্রকে বলছে, তুই বেউলো সাজতিস, তুই বেউলোই সাজবি।

এই বুড়ো বয়স, ভাঙা মুখ, ফোকলা দাঁত, এই চেহারায় বেউলো? যোগেন্দ্র হাসতে আরম্ভ করে দিলে, সঙ্গে সঙ্গে পাল।

হাসিটা থেমে এল ধীরে ধীরে। দুজনেই চুপ করে বসে রইল, ক্লান্ত হয়েছে দুজনেই; যোগেন্দ্রের বুকে তো ফিক-ব্যথার মত ধরে গিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এই নীরবতার অবসরে তাদের মনের চোখের সম্মুখে ভেসে উঠেছে পুরানো দিনের কথাগুলি। নিজেদের সেই যৌবন-কালের চেহারা মনে পড়ছে। সেকালের সঙ্গীদের যারা আজ নাই, তাদের মনে পড়েছে। শূর-বীরের মত চেহারা সব, কত হৈ-হৈ সে দিন। ভাবনা-চিন্তা ছিল না।

হবে না কেন? খামারে সব গোলা-ভরা ধান, গোয়াল-ভরা দুধালো গাই, কেঁড়ে ভর্তি দুধ, জালায় জালায় গুড়, পুকুর-ভরা মাছ, পৌষ-লক্ষ্মীতে সে কত সমারোহ,—গামলা-ভর্তি করে সরু-চাকলি, আস্‌কে পিঠে, ক্ষীরের পিঠে, গুড়তিলের পিঠে। কুড়ি গণ্ডায় এক পণ, সেই পণ দরুনে পিঠে খেত এক-একজন। মাঘ মাসে মূলো খেতে নাই, লক্ষ্মীর রাত্রে মূলোমচ্ছি, মূলোতে মাছে অম্বল হত। তারপর পড়তে ভাসানের আসর।

পাল চন্দ্রচূড় সাজত, রঙিন পাটের কাপড় পরে পাটের চাদরখানা পৈতের মত বেঁধে আসরে ঢুকত। আসরে জ্বলত সরকারী চল্লিশ-বাতির আলো! শিব শম্ভো! শিব শম্ভো! শঙ্কর! শঙ্কর! আসরখানা গমগম করে উঠত। উঠবার কথা যে। কালো কষ্টিপাথরে খোদাই-করা ভৈরবমূর্তির মত দশাশই চেহারা, সেই বাঘা গলায় আওয়াজ, লোকের বুকের ভিতর যেন গুরগুর করে উঠত! মেয়েরা বসত এক দিকে, পুরুষেরা বসত তিন দিকে, সব হাঁ করে চেয়ে থাকত চন্দ্রচূড়ের মুখের দিকে। মেয়েদের মাথার ঘোমটা খসে যেত। পুরুষদের হুঁকোর টান বন্ধ হত। ধীরে ধীরে তাজা কলকে নিবে আসত।

যোগেন্দ্রের ছিল ছিপছিপে মিষ্টি চেহারা, চোখ দুটি ছিল ডাগর; সে সাজত বেহুলা। গোঁফ-দাড়ি কোনোকালেই যোগেন্দ্রের বেশি নয়, তাও কামিয়ে পরচুলো পরে স্ত্রীর বিয়ের বেগুনি রঙের পাটের শাড়িখানা পরে আসরে এসে নামত, সঙ্গে সখী থাকত। মেয়েরা পরস্পরের গা টিপে মুচকে হাসত। পুরুষের চোখে পলক পড়ত না। লখীন্দরের দেহ নিয়ে কলার মান্দাসে নদীর জলে ভাসত। বেহুলা বলত শাশুড়ীকে, বাসরে আমার রান্না করা ভাত আছে, সে ভাত আমার মাটিতে পুঁতে রেখো। কাককে ডেকে বলত, কাক, তুমি

আমার বাপের বাড়ি গিয়ে মাকে বল, বেউলা জলে ভেসে যাচ্ছে। গান ধরত, জলে ভেসে যায়রে সোনার কমল!—গোটা আসর হাপুস-নয়নে কাঁদত।

এমন সময় ঠোঁটের কোণে চুন মেখে, গালে কপালে চুনের দাগ এঁকে, পায়ে ন্যাকড়া জড়িয়ে, মাথায় পাগড়ি বেঁধে, ভুঁড়ি দুলিয়ে খুঁড়িয়ে নেচে আসরে ঢুকত গোদা মালো। পোশাক পালটে পালই সাজত গোদা মালো; দেখে কার সাধ্য যে বলে, এই লোকই সেই পাথরের মত মানুষ চাঁদ সদাগর। পালের ভুঁড়ি নাচানোর কায়দাটি ছিল অদ্ভুত। সত্যই যেন নাচত ভুঁড়িটি; দেখে আসর সুদ্ধ লোক হেসে গড়িয়ে পড়ত। মেয়েরা বাঁকা দৃষ্টি হেনে বলত, মরণ! পৌষ মাস চলে যেত, মাঘ মাসের অন্তত পনরোটা দিন ছেলেমেয়েরা তাকে দেখলেই বলত, ওরে গোদা মালো আসছে। তরুণীর দল পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে ফিকফিক করে হাসত।

সে দিন আর এ দিন! আজকের দিনকালগুলা যেন ভাসান-গান ভাঙার পর শেষ রাত্রের আসর। চল্লিশ-বাতির চিমনিটা কালো হয়ে যেত কালি পড়ে। পৌষের শেষ রাত্রিতে হিম ঝরত চারিদিকে, চট তালাইগুলো ধুলোয় ধুলাকীর্ণ হয়ে বিশৃঙ্খলভাবে পড়ে থাকত; আসর আগলে তারা জনকয়েক শুধু প্রায় কুণ্ডলী পাকিয়ে বেঁকে চুরে শুয়ে থাকত; দু-চারটে কুকুরও এসে গা ঘেঁষে শুত; খাঁ খাঁ করত চারিদিকে। ঠিক তাই। ঠিক তাই। তারাই কজন ভাঙা আসর আগলে বেঁকে চুরে কোনমতে পড়ে আছে। চারদিক খাঁ খাঁ করছে।

যোগেন্দ্র একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, চল, বাড়ি চল।

—চল। পালও উঠল।

বাগান থেকে বেরিয়ে এসে কিন্তু দুজনেই দাঁড়িয়ে গেল থমকে। চাঁদের আলোয় আর কুয়াশায় যেন একখানা বকের পাখার মত ধবধবে সাদা মলমলের চাদর দিয়ে ঘুমন্ত মা-বসুমতীকে কে ঢেকে দিয়েছে। মদ অতি সামান্য খেয়েছে তারা। তবু অনভ্যস্ত মস্তিষ্কে তাই চনচন করছে। পাল বললে, চল, মাঠের ধার দিয়ে ঘুরে আসি একটু।

দুজনে এসে দাঁড়াল মাঠের ধারে। দুধ-বরণ জ্যোৎস্নার মধ্যে সোনার বরণ মেয়ে গা এলিয়ে ঘুমুচ্ছে। দুচোখ ভরে দেখেও আশ মেটে না।

পাল বললে, যগন্দ!

—আ-হা-হা পাল, সাক্ষাৎ লক্ষ্মী শুয়ে আছেন, তুমি দেখ।

—তাই বলছি যগন্দ, এইবার দিন ফিরল, তুমিও দেখ।

যোগেন্দ্র কথাটার ঠিক কি মানে তা বুঝতে পারলে না। পালের মুখের দিকে সে তাকিয়ে রইল।

পাল বললে, এটা পঞ্চাশ সাল। গেল পঞ্চাশ বছর দুধের কাল গিয়েছে যগন্দ, আসছে পঞ্চাশ বছর, দেখ তুমি, সুখের কাল হবে, দেখ, আমি বললাম। এই ত্রিশ টাকা মণ চাল, এই মড়ক—এই গেল দুর্ভোগের শেষ। এইবার, দেখ তুমি মাঠের দিকে তাকিয়ে, মা-লক্ষ্মী

আবার এলেন।

যোগেন্দ্র অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

পাল বললে, দেখ তুমি, আবার আগেকার মত কাল আসবে। বছর বছর জল হবে। মাঠ ভরে ধান হবে। আবার সব তেমনিই হবে। ব'স।

দুজনে বসল সেই শিশিরে ভেজা মাঠের আলের ঘাসের উপর।

পাল বললে, সাধে বলেছিলাম যগন্দ, লক্ষ্মীর রেতে এবারে ভাসানের গান করব। এবার মা-লক্ষ্মী পায়ে হেঁটে এসেছেন। অনেকদিন পরে সত্যি পৌষ-লক্ষ্মী হবে।

—তা বটে।

—আর একটুকুন লেবে নাকি?—পাল আবার বের করলে বোতলটা, আর গেলাসটা মুখে লাগানোই আছে।

—দাও। কিন্তু—

—কিন্তু কি?

—মা-লক্ষ্মী আবার গন্ধ সইতে পারেন না। হাজার হলেও নারায়ণের লক্ষ্মী, বষ্টুমের ঘরের বউ?

—হুঁ।—একটু ভেবে পাল বললে, তা বটে। তা—

যোগেন্দ্র বললে, বুঝে দেখ তুমি।

—ধান কাটা হয়ে যাক, তারপর আর ছোঁব না। বুঝলে? দেখছ তো ধান। এর জোর তো বুঝতে পারছ। নইলে তুলব কি করে? নাও।—নিজে খেয়ে পাল গেলাস বাড়িয়ে দিলে যোগেন্দ্রের দিকে।

—তা বটে।—যোগেন্দ্র হাত বাড়িয়ে নিলে গেলাসটি। জোর অনুভব করছে সে। পাল মিছে বলে নাই, ভোরে একটু খেয়ে মাঠে বের হলে সেও পালের মত ধান কাটতে পারবে। গোটা মাঠখানা ধানে থইথই করছে। এ ধান নইলে তুলবে কি করে?

—আর একটা মনের কথা বলি তোমাকে। এ খেয়ে যোগেন্দ্রের গায়ের জোর আর একটু বেড়েছে মনে হল। সে গলাটা সশব্দে বেশ সবল জোয়ানের মত ঝেড়ে নিয়ে মদের স্বাদভরা থুতু ফেলে বললে, কি?

—ওই চেকা—

যোগেন্দ্র তার মুখের দিকে তাকালে।

—ওই চেকার ধান কেটে ঘরে তোলার আগে আমাকে কেটে ঘরে তুলতে হবে। আমাকে বাই ঠুকে যায় হে। ওঃ।

—তা বটে।

—দাঁড়াও না। সকলেরই সুসময় আসছে এই পঞ্চাশ সাল থেকে। ওর ভিরকুটি, টাকার গরম, ধানের গরম এইবার ভাঙবে। মা এসেছেন, তুমি দেখ যগন্দ। এইবারেই দেখ, দেনা-দুনি শোধ করব আমি। খাজনা-দেনা এক পয়সা বাকি রাখব না। যা থাকবে,

থাকবে তোমার অনেক—বিঘে ভুঁই চার বিশ তো ফলবেই, কি বল ?

—তা খুব।

—তাহলেই, আমি হিসেব করেছি, সব দিয়ে-থুয়ে পৌটি তিনেক থাকবে। তিন ভাগ করব—বুঝলে ? তিনটি গোলা। একটি সরস্বতীর, একটি লক্ষ্মীর, একটি আমার। এই আমার বরাবর চলবে। এখনও বছর বিশেক বাঁচব আমি, খুব বাঁচব। দুটো গোলা নির্দ্দিষ্ট রেখে দেব আমার কম্মের জন্যে। বাকি যা থাকবে, ওরা যা খুশি তাই করবে।

যোগেন্দ্র বললে, ভালো যুক্তি, ভালো যুক্তি। আমাকেও এখনই বন্দোবস্ত করতে হবে।

—করতে হবে নয়, করে ফেলাও।

—কাল ভোরে যখন যাবে মাঠে, ডেক আমাকে। আর বোতলটা বরং নিয়ে এস, এক ঢোক না খেয়ে যেতে পারব না মাঠে।

পাল বললে, আসব।—তারপর হঠাৎ যেন তার কথাটা মনে পড়ল, বললে, হ্যাঁ, একটা কথা বলতে ভুলেছি।

—কি ?

—এর ওপর দুধ ভালো নয়। দুধ খাও তো বিকেলে খেও। এর পর ভালো হ'ল মাংস। তা ভাই, সে তো উপায় নাই। মাছটা বেশি খেও।

—মাছ ?—যোগেন্দ্র হাসলে।—পাব কোথা ?

—আঃ। জাল-টাল সব গিয়েছে হে। নইলে—। নইলে বাবুদের সায়রপুকুরে সে-কালের ফিস্টির রাত্রের মত জাল ফেলে মাছ ধরা কিছু বিচিত্র ছিল না মুকুন্দের পক্ষে। শরীরে তার যথেষ্ট জোর আছে। ওই চেকার চেয়ে জোরে ঘুরিয়ে জাল সে ফেলতে পারে—একথা সে বাজি রেখে বলতে পারে। বাবুদের পুকুর কেন ? জাল থাকলে আজ চেকার পুকুরেই ফেলত জাল। সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে।

যোগেন্দ্র বললে, ভোরে ডেকো যেন।

চার

মাঠ-থইথই-করা ধান মুকুন্দ কেটে চলে জোয়ানের মত। হা-হা করে হাসছে। যোগেন্দ্রও কাটছে। সেও যেন তাকত অনেকটা ফিরে পেয়েছে। অন্য সকলেও কাটছে। মুকুন্দ-যোগেন্দ্রের মৃতসঞ্জীবনীর নেশার জোর তাদের নাই, কিন্তু ধানের নেশা তাদের পেয়েছে।

মাঠে মাঠে থাকবন্দী ধান ছোট ছোট ঘরের মত আকারে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। যেন মেলা বসে গেছে বলে মনে হচ্ছে দূর থেকে। গাড়িতে গাড়িতে সেই ধান ক্রমে ঘরে নিয়ে চলেছে সব। মুকুন্দের কেলে সত্যিই সাবাস জোয়ান, মুকুন্দ এবার তার ওই নাম দিয়েছে। সামনে টেনে চলেছে জোয়ান বলদটার ডাইনে থেকে। মুকুন্দ গাড়িতে ধান বোঝাই

করছিল। দুখানা জমির ওপারের খানার উপর দিয়েই পড়েছে জমি বরাবর গাড়ির রাস্তা। একখানা গাড়ি চলেছে, হৈ-হৈ করে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে গাড়ি। কোঠাঘরের মত ধান বোঝাই করেছে গাড়িতে। ধুলো উড়ছে। চেকার গাড়ি চলেছে। নইলে এমন গরু আর কার হবে। হ্যাঁ চেকাই বটে। ওই যে গাড়িতে বোঝাই ধানের মাথায় বসে আছে, চালের মটকায় হনুমানের মত।

—হ কত্তা—

মুকুন্দ দাঁতে দাঁত টিপে ধরে তার দিকে চাইলে শুধু।

—হবে নাকি ?—বাই ঠুকছে চেকা, হি-হি করে হাসছে।

পাল একটা মাটির ঢেলা নিয়ে ছুঁড়লে, অবশ্য অন্যদিকে ছুঁড়লে, ছুঁড়ে বলে উঠল, উ-লে-লে-লে।—অর্থাৎ হনুমান তাড়াচ্ছে সে। সঙ্গে সঙ্গে হা-হা করে হেসে উঠল। সেই হাসি। তারপর সে দুইহাতের মুঠোতে ধরে টেনে তুলতে লাগল ধানের আঁটি। এবারকার ধানে তার আড়াই মুঠোয় বাঁধা আঁটি। আড়াই হাত তিন হাত লম্বা খড়। ধান তুলছিল আর হাসছিল।

—যাঃ শালা!—পাল হাতের আঁটিগুলো ফেলে দিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াল। হাঁপ ধরে গেছে হেসে।—শালাঃ। শালা চেকা। শালা আবার লক্ষ্মীতে অন্নপূর্ণা পূজা করবে এবার। হিংসুটে বাৎমাস। রক্তের তেজ, জোয়ানীর দেমাক, আর টাকার গরমে ধরাকে সরার মত দেখছে। এবার লক্ষ্মীপুজোয় বারোয়ারি থেকে ভাসান গান হবে ঠিক হয়েছে। ও অমনিই অন্নপূর্ণা পূজার ধুয়ো তুলেছে। তুলুক। দশের লাঠি একের বোঝা। দশজনের চাঁদায় হবে বারোয়ারি। ওর একার পুজো। দশেও এবার লক্ষ্মীছাড়া নয়। উনো লক্ষ্মী এবার দুনো হয়েছেন। মাঠ ভরা ধানে খামার গোলা ছয়লাপ হয়ে যাবে। দশ টাকা মণ ধানের। পঞ্চাশের পর থেকে মা দুনো হয়েই আসবেন বছর বছর।

'এস পৌষ, বস পৌষ, জন্ম-জন্ম থাক; গেরস্ত ভরিয়ে থাক, দুধে-ভাতে রাখ।' এবার সেই দুধে-ভাতে রাখার পৌষ এসেছে। পঞ্চাশ বছর দুঃখের পর পঞ্চাশ বছর সুখ; এতদিন পৌষ এসে বাউনির বাঁধন মাপে নাই, মাঘ মাস যেতে না যেতে গোলা খালি হয়েছে, খাজনায় মহাজনের পাওনায় সব কর্পূরের মত য়েন উবে গিয়েছে। আসছে বছরের খোরাকির জন্য আবার মহাজন ঠিক করতে হয়েছে। এ গাঁয়ের মহাজন ওই চেকা। ওই ওরই দোরে যেতে হয়েছে মানুষকে। এবার যা নমুনা তাতে ওর দোরে আর যেতে হবে না। বছর বছর যদি এমনই পৌষ আসে, মাঠ-থই-থই-করা ধান, খামার-ভতি গোলা-ভর্তি ঘর-ভতি করা পৌষ, তবে সে পৌষ আর যাবে না। সে জন্ম-জন্মই থাকবে, গেরস্তকে দুধে ভাতেই রাখবে। ছেলে-পুলে খোরা-পাথর ভরে ভাত খাবে। আবার হবে এই জোয়ান। মোল্যানীরাও হবে আবার দলমলে মেয়ে, তাদের এক ফুঁয়ে শাঁখ বেজে উঠবে শিঙের মত, এক দুপুর ঢেঁকিতে পাড় দিয়ে কুটে তুলবে বিশ দরুণে ধান। গোটা বাড়িটা নিত্য নিকিয়ে

তুলবে গোবর আর রাঙা মাটির গোলায়, ঘরে খামারের চতুঃসীমায় কোথাও থাকবে না এতটুকু ঝুল, কি পাতা, কি কুটো, কি ময়লা। পৌষ সংক্রান্তির ভোর রাত্রে তারা যখন প্রদীপ জ্বেলে, ধূপ দিয়ে, রঙ-করা চালগুঁড়োর আলপনা এঁকে, শুদ্ধ কাপড়ে, শুদ্ধ মনে পৌষকে বলবে—পৌষ পৌষ পৌষ বড় ঘরের মেঝেয় উঠে বস—পৌষ তখন কি যেতে পারবে? পঞ্চাশ সাল, শয়ে শূন্যের অর্ধেক হল পঞ্চাশ—এটা হল সর্বনাশের বছর। হয়েছেও সর্বনাশ, কাল যুদ্ধে নাকি লাখে লাখে মানুষ মরেছে, তিরিশ টাকা মণ চাল, দশ-পনরো টাকা জোড়া কাপড়, নুন নাই, চিনি নাই, ওষুধ নাই, দেশ-ভাসানো বান, রোগ-মড়ক, সর্বনাশের আর বাকি কি? কিন্তু অতি মন্দর পরেই নাকি ভালো আসে, শুকনো গাছে ফুল ফোটার মত এবার সেই আলোর নমুনা দেখা দিয়েছে মাঠ-ভরা ধানে। পালের অকাট্য ধারণা তাই। ভালো বছর এইবার থেকে আরম্ভ হল। নিশ্চয়—নিশ্চয়—নিশ্চয়। এই চৈত্রনাগাদ যুদ্ধ মিটে যাবে, রোগ এই বসন্তের বাতাস বইলেই দূর হবে। সুবাতাসের মুখে রোগ কতক্ষণ? সুসময় এলে, দুঃখ অভাব সব পালায়, আলো ফুটলে দুঃস্বপ্নের মত।

পাল আবার তুলতে আরম্ভ করলে ধানের আঁটি। হাঁপটা এইবার গিয়েছে। ধান-পান তুলে সে একেবারে যাবে পারুলের কবরেজের কাছে। চিকিৎসা করাবে। শরীরটাকে তাজা করতে হবে। বয়স অবশ্য হয়েছে, তবে ষাট বছর কি এমন বয়স? তার বাবার জ্যাঠা ষাট বছর বয়সে ফের বিয়ে করেছিল; সেই স্ত্রীর তিন কন্যে হয়। শুধু তাই নয়, সে স্ত্রী যখন মরে, তখনও বুড়ো বেঁচে ছিল, তারপরও সে মাঠে যেত। বাঁচতে তাকে হবে। সমর্থও থাকতে হবে। সরস্বতীর ছেলেটাকে মানুষ না করে সে মরতে পারবে না। না হলে ওই চেকাই সর্বনাশ করে দেবে। সরস্বতীর উপর নজরও যে সে না দিতে পারে, এমনও নয়। হুসহুস করে করে সে ধান তুলতে লাগল।

আবার হৈ-হৈ উঠছে। কার গাড়ি আসছে। কিন্তু গাড়ি কই? কোথায়? তবে? কি হল? কার কি হল? কান খাড়া করে পাল শুনলে, কোন দিক থেকে আসছে হৈ-হৈ শব্দটা? গ্রামের দিক থেকে মনে হচ্ছে। কার কি হল? বুকটা তার ধড়াস করে উঠল। সরস্বতীর ছেলেটা—পাল দ্রুতপদে চলতে আরম্ভ করল।

—কে? কে হে? ওহে!—একটা লোক গাঁয়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে জোর হাঁটনে চলেছে কোথায়।—কে হে?

—আমি শশী।

—গাঁয়ে গোল কিসের?

—রমন কাকা—

—কি, কি হল?

—রমনকাকা মারা গেল। ধানের পালুই বাঁধতে বাঁধতে, বুকে কি হল বলে, বাস। আমি চললাম কাকার জামাইকে ডাকতে।

রমন পাল মরে গেল। মুকুন্দদের দলের লোক সে। একবয়সী। ভালো লোক—বন্ধু

লোক। ভাসানের দলে সাজত নারদ মুনি। দিন রাত্রি হরি হরি করেই সারা হত রমন। পালের চোখে জল এল রমনকে মনে করে। কিন্তু এইটুকু জোরে হেঁটেই আবার হাঁপ ধরেছে। একটু মৃতসঞ্জীবনী হলে হত। ভালো ওষুধ। বার বার—বার বার মুকুন্দ রমনকে বলেছিল, রমন, ওষুধটা ভালো ওষুধ, খাও। নইলে পারবে না। রমন বলেছিল, ছি! না। নারায়ণ। আমার গোবিন্দ আছেন।—মূর্খ—মূর্খ। গোবিন্দ ওষুধ খেতে বারণ করেন না, আর যদিও করেন, তবে যাও ধর্ম নিয়েই স্বর্গে যাও।

পাল ফিরল মাঠের দিকে। ধান পড়ে আছে, গরু বাঁধা আছে। আজ এ ক্ষেতের ধানটা তুলতেই হবে। শুধু তোলা নয়, আজ কতকটা ধান পিটে, কিছু ধানও বিক্রি করতে হবে। পৌষের আজ হল চব্বিশে। জমিদারের লাটবন্দী যাবে আটাশে। তার আগে খাজনা কিছুটা দিতেই হবে। সে না দেওয়াটা দারুণ অন্যায়। চিরকাল দিয়ে এসেছে। তা ছাড়া লক্ষ্মীর আয়োজন আছে। সরস্বতীর কাপড় ছিঁড়েছে, লক্ষ্মীরও কাপড় চাই, নিজেরও চাই, সরস্বতীর ছেলের একটা দোলাই চাই। পূজা থেকে কাপড় হয় নাই। সে আবার মাঠে এসে ধান বোঝাই করতে লাগল। হুসহুস করে বোঝাই করে চলল ধান। বাপ রে, বাপ রে, ধান আর শেষ হবে না যেন! এ গাড়িতে আর ধরবে না। বোধ হয় এই বেশি হয়ে গেল। বোঝাই ধানের উপরে বাঁশটা দিয়ে শনের রশি টেনে কষে বাঁধতে বাঁধতে একবার ভাবলে পাল। বেশি হয়েছে কিছু। তা হোক। পরক্ষণেই সে হাসল। বেশি? হায় রে কলিকাল। সে আমল হলে—হায়, হায়, হায়। সে কাল কি আর আছে? সে আমলে পালের একবার একটা বলদ হঠাৎ মরে গিয়েছিল, এমনিই ভর্তি ধান তোলার সময়। গরুর জন্য ধান তোলা বন্ধ ছিল না পালের। এক দিকে গরু জুড়ে, আর এক দিকে নিজে দুই হাতের খাঁজে জোয়াল ধরে বুক দিয়ে টেনে তুলেছিল ধান। আর আজ? এ ধান কটা না হলে চলবে না যে, বরং আরও চারটি হলে ভালো হত। খাজনা, লক্ষ্মীর উয়্যুগ, কাপড়। বাঁশটা কষে পাল নিজে গাড়ির মুখটা একবার তুলে দেখলে। হুঁ বেশি হয়েছে।—কি রে কেলে? পারবি না বেটা?

কেলে নিজের নাম বেশ বুঝতে পারে। পালের দিকে চেয়ে সে ফোঁস করে উঠল। পাল হাসলে, হ্যাঁ, পারবি। তোর জন্যে তো ভাবি না রে। ভাবনা—ওই মর্কট জোয়ানটার জন্যে। বেটা আমার জোয়ান! পারে কেবল শিং নাড়াতে। নে, চল দেখি। আজ তোমারই একদিন কি আমারই একদিন। আপন মনেই পাল গরু দুটের সঙ্গে বকতে বকতে গাড়ি জুতলে। ধানের গাদায় লুকানো ছিল সঞ্জীবনী বোতলটা। এক ঢোক খেয়ে, শরীরটায় চাড়া দিয়ে নিজের শক্তিটা অনুভব করে নিয়ে বললে, চল, চল, বেটা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ।

গাড়ির জোয়ালটা গরু দুটোর কাঁধে চেপে বসেছে; কেলের পিঠ ধনুকের মত বেঁকেছে, পিছনের পা দুটোর ঠেলা দিয়ে তীরের মত সোজা করতে চাইছে সে। ঘাড়টা টানের চোটে লম্বা হয়ে উঠেছে। নড়েছে। সাবাস বেটা! আচ্ছা! জোয়ানটাও টানছে।—বলিহারি, বলিহারি রে ব্যাটা! বাপ রে—ধন রে—মানিক রে! হ্যাঁয়—হ্যাঁয়—হ্যাঁয়!

গাড়ি চলেছে—গাড়ির উপর কোঠা ঘরের মত বোঝাই করা ধান দুলছে—মা লক্ষ্মী হেলে দুলে চলেছেন তার ঘরে।

গাড়িটা থেমে গেল, শব্দ হল একটা খ্যাঁচ করে। একটা আলের কাটে চাকা আটকে গেল। বাঁ দিকে জোয়ান গরুটাকে তাড়া দিয়ে পাল বললে, শালা, ভাত খাবার যম তুমি!—সে কষে দিলে এক পাঁচন-লাঠির বাড়ি। গরুটা টানলে। চাকাটা নড়ল। কিন্তু ওদিকের নড়ল না। কেলে টানছে; মুখ দিয়ে ফেনা ভাঙছে তার, কিন্তু চাকা নড়ছে না।

—কেলে, লে বেটা, লে। হ্যাঁয়-হ্যাঁয়। কেলে।

চাকা নড়ছে না। কেলে পারছে না টেনে তুলতে।—কেলে। কেলে। পাল খেয়ে নিলে আর এক ঢোক। শরীরটাকে আর একবার চাড়া দিলে। তারপর চাকার কাঠ দুই হাতে ধরে বুক দিয়ে ঠেলতে আরম্ভ করলে—দাঁতে দাঁতে কষে টিপে। পাকা শাল-খুঁটির মত পালের সর্বাঙ্গ শক্ত হয়ে উঠল। উঠেছে, হাঁ, উঠেছে। বহুত আচ্ছা। উঠে গেছে গাড়িখানা। আবার চলছে। পালের বুকে, হাতে, মুখেও লেগেছে চাকার ধুলো। শরীরটা যেন সেকালের শরীরের মত ফুলে উঠেছে। হ্যাঁ, ঠিক হ্যায়। সে জোয়ানই আছে। শুধু হাঁপ ধরেছে। খানিকটা বুকের ভিতরটা ধড়ধড় করেছে একটু বেশি। হ্যাঁ, একটু বেশি। পাল একটা দীর্ঘনিশ্বাস টেনে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। গাড়ির উপরে ধানের বোঝাই ঠিক আছে। হেলছে দুলছে। উঃ। বুকটা নিয়ে সোজা হওয়া যাচ্ছে না। এ কি! এ কি হল? আঃ, নাক দিয়ে গড়াচ্ছে গরম? আঃ,।বুকের ভিতরটা! এক হাত বুকে দিয়ে, আর এক হাতে পাল নাকটা মুছলে। এ কি! এ যে রক্ত! এ কি! থরথর করে কেঁপে উঠল পাল। বুকের ভিতর কেমন করছে! চারিদিক কেমন হয়ে আসছে! চাঁদনী রাতের বকের পালকের মত রঙের মলমলে ঢাকা মা-বসুমতী—! এ কি! তার এ কি হল? সরস্বতী, তার ছেলে, লক্ষ্মী, মাঠ-ভরা ধান, এ ফেলে—। সে দুই হাতে আঁকড়ে ধরলে তার গাড়িতে বোঝাই ধানের আঁটির ডগা। আঁটির ডগায় ফলন্ত ধান। জোরে, সজোরে চেপে ধরলে। নইলে পড়ে যাবে যে। গাড়ি চলছিল। পালের দুই হাতের মুঠোর মধ্যে ছিঁড়ে এল মুঠা-ভর্তি ধান। গাড়ি চলে গেল। পাল মাটিতে পড়ে গেল মহাপ্রস্থানের পথে ভীমের মত। বারকতক পা দুটো ছুঁড়লে—নাকটা মুখটা ঘষলে ক্ষেতের ধুলার উপর, এক মুখ ধুলা কামড়ে ধরলে বাঁচবার ব্যগ্রতায়। রক্তে মাটিতে মিশে একাকার হয়ে গেল। ধান-ভরা মুঠা-বাঁধা হাত দুখানা প্রসারিত করে দিয়ে সমস্ত আক্ষেপ তার স্তব্ধ হয়ে গেল পরমুহূর্তে।

সংক্রান্তির শেষরাত্রে পালের বাড়িতে পৌষ আগলাতে উঠে সরস্বতী লক্ষ্মী শুধু কাঁদলে। কাঁদতে কাঁদতেই কোন রকমে পৌষ পূজার ছড়া বললে। শাঁখটা বাজাতে গিয়ে বাজাতেই পারলে না।

যোগেন্দ্র উঠে বসে ছিল ঘরে চুপ করে। রমন মরেছে, মুকুন্দ মরেছে, এইবার—সে হড়াম করে খোলা জানালাটা বন্ধ করে দিলে।